বাঙালী বিভাগ

বিজ্ঞান চর্চায় দুই সাধক

দীপায়ন কর
স্নাতক, দ্বিতীয় বর্ষ

উনিশ শতকে ভারতকে বিশ্বের বিজ্ঞান মানচিত্রে সসম্মানে ঠাই করে দেওয়ার বিরল কৃতিত্বেয়ে দাবী করতে পারেন দুই বাঙালী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু এক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ফরিদাপুরের (বাংলাদেশ) ছোট একটি বিদ্যালয়। পিতা ভগবান চন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত এই বাংলা স্কুলে সাধারণ গৃহস্থ, হলে এবং চাষীর ছেলেরাই ছিল তাঁর সহপাঠী। এদের থেকে আলাদা-ধনীর সন্তান হলেও বেশভুষায় নেই কোন চাফচিক্য। বুদ্ধির আলোয় দীপ্ত, স্বভাৰ সুমধুর পড়ালোনাতেও সে সবার সেরা। কিন্তু তাঁর প্রশ্নবানে সহপাঠীরা অতিষ্ঠ - আচ্ছা ভাই এটা কি আছে? 'ও লতাটার নাম কি?' কি করে জন্মায় ওরা? 'বাঁচে কিসে?' সহপাঠীরা হাসে, বলে ঃ পাগল'।

ছেলেবেলায় এমনই জ্ঞান পাগল ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিতা, কিন্তু অহঙ্কার ছিল না বিন্দুমাত্র, পুত্রকে তিনি সাধারণ লোকের ছেলেদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বাংলা স্কুলে ভর্ত্তি করেন। দরিদ্র কৃষকদের সন্তানদের সঙ্গে মিশে জগদীশচন্দ্র জলজন্তুর কথা, গাছ পালার কথা শুনে ভাল করে চিনলেন। ভবিষ্যতে - তাঁর সঙ্গে গাছ পালার গ?ভীর মিতালির সূত্রপাত হল এখানেই।

ডাক্তারি পড়বার জন্য বিলাতে যান বটে কিন্তু বার বার জ্বরে আক্রান্ত হওপর চিকিৎসাবিদ্যার অত্যধিক পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যাল থেকে বিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্বয় ট্রাই (পাস) সঙ্গে পাশ করেন এবং অল্প দিন পরে লণ্ডনের বি. এম. সি উপাধিও পেলেন।

স্বদেশে পত্যাবর্তন করে কলকাতার প্রেসিডে সী কলেজ অধ্যাপনা ও গবেষণায় মগ্ন হন। ঐ কলেজের গবেষণাগারটি ছিল তখন ভারি ছোট - যন্ত্র পাতিরও ছিল বেজায় অভাব। সরকাৰ থিকে যন্ত্রপাতিক্রয়ের কোন টাকা পাবার সম্ভাৱনা না থাকায় নিজস্ব উদ্যোগেই দেশী মিস্ত্রির সহায়তার যন্ত্রপাতি তৈরি করে গবেষণার কাজ শুরু করেন। ক্রমে দেশবিদেশের বৈজ্ঞানিক সমাজ তার গবেষণার মূল্য উপলব্ধি করেন এক সগুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-এম সি উপাধি পান।

এরপর জগদীশচন্দ্র একটি ছোট যন্ত্র তৈরি করে তার সাহার্য্য বিনা তারে শব্দ প্রেরণ করেন। অর্থলোভ ছিল তার তিনি যন্ত্রটি আইনের সাহার্য্য নিজের করে রাখবার চেষ্টা করেননি। ফলে, বেতাবের প্রকৃত অবিস্কারক হয়েও ইটালির মার্কনির ভাগ্যেই সে সম্মান জুটে গেল।

এভাকে বিরাট সিদ্ধি নষ্ট হয়ে গেলেও জগদীশচন্দ্র হতাশ হেলেন না। গাছপালারও নে চেতনা আছে তারাও সুখ-দুখ ব্যথা-বেদনা অনুভব করে - এ কথা তিনিই আবিষ্কার করেন। 'ক্রোসকোগ্রাফ' নামে নতুন একটি যন্ত্রের সাহার্য্য এ বিষয়ে প্রমানের স্বাক্ষর রাখেন। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান জগতে এক নবযুগের সৃষ্টি হল। দেশবিদেশের বিদ্বজ্জন জগদীশচন্দ্রকে সসম্মানে গ্রহণ করলেন।

জগদীশচন্দ্র ভারতবর্ষকে বিশেষত ঃ বঙ্গদেশকে প্রাক্ষপেক্ষা বেশি ভালবাসতেন বলেই তিনি ভারত তথা বাংলার বাইরে লিয়ে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন না। এমবার বিলাতে একসভায় তিনি সদর্পে ঘোষণা করেন, 'শীঘ্রেই ভারতের বিজ্ঞান কুঞ্জে শত শত কোকিল ডাকবে।' জগদীশচন্দ্রের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত, খ্যাতনামা ভারতীয় বিজ্ঞানীর সংখ্যা আজ বড় কম নয়।

বঙ্গসাহিত্য ও এই মহান আচার্যের মূল্যবান অবদান রয়েছে যার মধ্যে বিজ্ঞান গ্রন্থ 'অব্যক্ত' একখানি অতুলনীয় সাহিত্য সৃষ্টি। তাঁর অন্যতম কীর্তি 'বসু বিজ্ঞানমন্দির' সম্পূর্ণ নিজের অর্থে ভারতীয় ধীতিতে নিমার্ণ করান। ভারতবর্ষে মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতিকল্পেই মন্দিরটি স্থাপন করেন। এ মহান বিজ্ঞান সাধকের জীবন ও কর্মবাজি শুদ্ধ হয়ে যায় ঐনআশি ব্যসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন -

'আমাক যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানেই জন্মগ্রহণ করিতাম।'

পরনে মোটা খাটো ধুতি, গায়ে সাধারণ একটি কোট - সবকটা বোতাম নেই, নে কটা আছে তাও সব আটকান নেই - চুলে বুঝি চিরুমি পড়েনি লোকটি কিন্তু নারাব নন মোটেই। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা অধ্যাপক + মাসিক আয় হাজার টাকার উপর কিন্তু সব দান করে দেন।

বিশ্ব-সেরাবিজ্ঞানীদের অন্যতম দেশজোড়া যার খ্যাতি তিনি একদিন গন্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলা পচারিতা পটে এক দুস্থ ছেলের কাছ থেকে পত্র পান - পড়াশোনা চালাবার জন্য সাহার্য্য প্রার্থনাকরে লেখা। ভদ্রলোক তৎক্ষনাৎ পোষ্টকার্ড নিয়ে লিখে জানান ছেলেটিকে যেন তাঁর সঙ্গেঁ সাক্ষাত করে। অচেনা বলে আর দশজনার যত উপেক্ষা করলেন না।

বন্যাাসী দেশে সরকারের তবসে প্রতিকারের তেমন চেষ্টা হচ্ছে না। সমাজের বিজ্ঞজনের দেশবাসীকে নির্দেশ করছে বস্যকর্ত্তদের সহায়তা করতে কিন্তু নিজেরা এই ভয়ঙ্কর বিপদে এগিয়ে আসে না। বিজ্ঞানটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে পড়া। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ছুটে পেলেন ছাত্রদের সঙ্গে করে। নিজের সমস্ত আয়, দেশবাসীর কাছ থেকে গ্রহণ করা চাঁদার সাহায্য' অমানুষিক পরিশ্রম করে দুশতদের সেবা করতে লাগলেন।

এই নিরাভিমান সেবাব্রতী বিজ্ঞানীই হলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। গেলেবেলা কেটেছ শ্রীমান সরল পরিবে, বাড়ীর পাঠশালাতেই হাতেখড়ি, নাজুক লহেও বন্ধুদের পাল্লায় পড়লে আম জাম কাঁঠালের ব্যনই তৃপ্তি। পরে কলকাতার হেয়ার স্কুল, আলবার্ট স্কুল, মেটোপলিটন কলেজে পড়াশোনা করেন, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে ছাত্রবৃত্তি লাভ করে বিদেশযাত্রা করেন। কৃতী ছাত্র ইংল্যাণ্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস. সি উপাধি পান। লুপ্ত হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রকে তিনিই পুনরায় সঞ্জীবিত করলেন - তারই উৎলাহে ভারতবর্ষে প্রবলভাবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়।

চাকুরা ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের দু'চক্ষুরে বিষ। চাকরি প্রিয় বাঙ্গালীকে তিনি সব সময় ব্যবসায় করবার জন্য উৎসাহিত করেছেন। কলকাতার বিখ্যাত "বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিটিউক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড" তাঁরই সৃষ্টি। এটি গড়ে তুলতে তাঁকে দারুন পরিশ্রম করতে হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে দেশীয় লতা-গুল্ম থেকেওষুধ তৈরীর চেষ্টা- তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। ব্যবসায়ের ক্ষেত্র সততাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। একবার এ কোম্পানিতে দুশ বোতল সিরাপ একটু নষ্ট হয়ে গেলে কর্মচারীরা তাঁকে হানায় খদ্দেরা টের পাবে না, চালিয়ে নেওয়া যাবে। প্রফুল্লচন্দ্র কিন্তু রাজী হলেন নাষ তাঁর কাছে দুশ বোতল সিরাপের চেয়ে কোম্পানীর সুনামের মূল্য অনেক বেশী তাই তিনি নিজের উদ্যোগ সমস্ত সিরাপ নষ্ট করে ছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হলেও নিজের ভোগের জন্য একটি পয়সাত্ত ব্যয় করেনিন। প্রাচীন ভরতের ঋষিদের মত নিঃস্বার্থ ভবে সাধনা করে গেছেন জীবন ভর।

অসাধারন পরিশ্রমী, উদ্দারমনা ও খাঁটি মনুষ্যত্বের অধিকারী মানুষটির জীবনকাল সম্পন্ন হয় ৮৩ ব্যশর বয়সে। বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিটিউক্যাল ওয়ার্কস তৈরী ভেষজ ওষুধ তৈরী বন্যা আনে ছুটে যাওয়া, এরমধ্যে ছাত্রদের জন্য লেখা সবকিছু একা করেছেন। সরল আমাড়ম্বর ভাবে জীবন কাটিলে কর্ম বহুলতা দিয়ে প্রমান করেছেন একহাতে অনেক কিছু করা যায়। প্রচুর আয় করেছেন কিন্তু তা প্রায় সমস্তই দান করে গেছেন। মানবতাবাদী, সমাজসেবক, মহানশিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্রর ন্যায় দেশহিতৈষী খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।

ছিত্রিশ শাসকের পরিমণ্ডলে ভারতকে বিশ্বের বিজ্ঞান মানচিত্রে বিশেষ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন এই দুই কৃতিবিদ্য পুরুষ?

❑❑❑

কাগজ তৈরীর ইতিহাস

সঞ্জীব দাস
বিজ্ঞান বিভাগ
দ্বাদশ শ্রেণী

প্যাপিরাস পুঁথির কথা তো তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। এবার বরং, কাগজ কেমন করে এলো, সেই নিয়ে গল্প হোক একটু।

কাগজক ইংমেজিত বলি 'পেপার'।

জার্মাণ ভাষায় বলে 'পেপিয়ীর'।

কিন্তু বাংলায় এই কাগজ কথাটাও আমরা পেয়েছি ফরাছি কথা। কারণ, চীনারাই প্রথম কাগজ তৈরী করেছিল পৃথিনীতে অনেকেই জানেন, কাগজকে ওরা বলে, কায়গৎ?

ইতিহাসের কথায় আজ থেকে প্রায় আঠারশ পঁচানব্বই বছর আগে কাগজ তৈরি হয়েছে চীনো সাল তারিখের কথা উঠলে বলতেই হয় ১০৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা সেটা।

হো টি তখন চীন দেশের সম্রাট।

তাঁরই উপদেষ্টাদের মধ্যে একজন ভারি কাজের লোক ছিলেন-তি সাইলুন। সম্রাট তাঁকে ধাতির করতেন খুব।

চীনে তখন লিপিকারেরা লিখতেন বাঁশের ফলকে। লিখতে লিখতে বাঁশের বদলে শিল্পীরা পছন্দ করলেন রেশম আর কাপড়ারে। কিন্তু খরচের কথা শুনলে হাঁ হতে হয় সবাইকে। তি সাই লুন এসব নিয়েই ভাবছিলেন অনেকদিন থেকে কম খরচায় কি ভাবে লেখার কাজে ব্যবহার করা যায় অন্য কিছু।

প্রকৃতিই যেন প্রথম সন্ধান প্রথম সন্ধান দিল কাগজের। সে ভারি মজার গল্প।

তি সাই লুন একদিন বসে আছেল তাঁর বাগানে। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা বোলতাকে (মৌমাছি)। সে বাসা বানাচ্ছে, কি সুন্দর।

দিনের পর দিন দেখতে লাগলেন তি সাই লুনা। বোলতাটা ফুলের গর্ভকেশর নিয়ে নিয়ে একবার যাচ্ছে আর আসেছে। বাসা তৈরির সময় শরীর থেকে বার করছে এরকম চটচটে আঠা। সেই আঠার সঙ্গে গর্ভকেশর মিলিয়ে চাক তৈরি করছে কি সুন্দর।

তি সাই লুনড তো একজন শিল্পী।

সেখান থেকেই তিনি পেয়ে গেলেন কাগজ তৈরির কৌশল। দেরি সইল না তাঁর। সেদিনই সঙ্গে সঙ্গে গাছের ছাল। পুৰনো কাপড়ের আঁশ, নানারকম ছিবড়ে একসঙ্গে মিশিয়ে জলে ভিজিয়ে রাখলেনতিনি। পরের দিন মুগুর দিয়ে পিটিয়ে তৈরি করলেন তৈরি করলেন একটা মণ্ড। তার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন গঁদেৰ আঠা।

তারপর বাশেঁর ফ্রেমে আঁটলেন একটা রেশমি কাপড়। সেই কাপড়ের পরেই আস্তে আস্তে বিছিয়ে দিলেন আঠা মেশানো মণ্ডের আস্তরণ। রোদে দিলেন সব শেষে। কাগজ তৈরির খবর শুনে সম্রাট এমণ ঘুশি হলেন যে, সম্মানজনক উপাধি দিলেন তি সাই লুনকে।

কিন্তু কাগজ তৈরির কাজ তো আর বন্ধ থাকতে

পারেনা। তি সাই লুনের এক শিষ্য ছিলেন দারুণ কাজের। জো জুয়ী তাঁর নাম। বলতে পারা যায় কাগজ শিল্পের উন্নতি হয়েছিল তাঁরই চেষ্টায়।

পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ তখনও জানতে পারেনি কাগজ তৈরির কৌশল।

চীনরাও খুব চালাক।

গোপনেই গোটা দেশ জুড়ে গড়ে তুলেছিল কাগজ শিল্প। সতর্কতা ছিল সীমানায়। শিল্পীদের কাছেও। সাবধান, অন্য দেশের কেউ যেন জানতে নাপারে কাগজ তৈরীর কলা-কৌশল।

তবু কতকাল আর শিল্পীয় থাকবেন শাসনে।

চীনের মধ্যেই কোরিয়া। সেখান থেকেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কিছু কাগজের পুঁথি নিয়ে গেলেন জাপানে। সময়ের হিসেবে সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিক তখন। সেই সন্ন্যাসীদের মধ্যেই একজন ছিলেন কাগজ-শিল্পী তাঁর নাম ডোকিও। তাঁরই চেষ্টায় কাগজ তৈরির গোড়াপওন হয়েছিল জাপানে।

তার পরই এল সমর কন্দের সেই যুদ্ধ। ইতিহাসের পাতায় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় সেটা। আরবদের হাতে বন্দি হল বেশ কজন চীনা সৈন্য। তাদের মধ্যে কাগজ তৈরির কলাকৌশল জানত কেউ কেউ তাদের দিয়েই কাজ শুরু হল সমরকন্দে। দেখতে কাগজ শিল্পের দারুণ সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সেখানেও।

তারপর বাগদাদ।

সেখান থেকে মিশড়।

দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মরক্কো। শেষের দিকে স্পেন সেখান থেকেই একদিন গোটা ইউরোপ শিখে ফেললে কাগজ তৈরীর গোপন কৌশল প্যাপিরাসের দিন শেষ হৈয়ে পৃথিবীতে এমনি করেই জাঁকিয়ে বসল পেপার। বাংলায় আমরা এখন যাকে কাগজ বলেই গ্রহণ করি বেশি।

❑❑❑

আজব দুনিয়ার আজব কাহিনী

কৌশিক দত্ত
স্নাতক চূড়ান্ত বর্ষ
রাসায়ন বিদ্যা বিভাগ

'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা ওঢালে
হে ছলনা ময়ী।'

সত্যিই সেই চলনাময়ী বিচিত্র এই পৃথিবীকে করে রেখেছেন রহস্যময়। সুতীক্ষ পর্বতশৃঙ্গের বক্ষ চিরে উন্মাদিনী তচিনী সবেগে বয়ে চলছে, সহানর্ব তার চঞ্চল তরঙ্গের আঘাতে তটভূমিকে নিয়ত করছে ধৌত, প্রভাত সমীরনের সুকোমল স্পর্শে নবরূপ লাভ করে কলি অচিরেই ফুল হয়ে ফুটছে, ... আর ও কত কি বৃহত্তর মানব সত্তার অজান্তেই হয়ে চলছে। জ্ঞানপিপাসু মনুষ্য এই অজানা দেশের ঘোর রহস্য আবৃত সত্যক উদঘাটন করার অভিপ্রায়ে নিত্য নতুন আশা নিয়ে দশদিকে ছুটে চলছে। তাদরই মধ্যে কেউগেল কুমেরু, কেউ গেল হিমালয়, কেউ বা গেল বনে-জঙ্গলে, অসীম অন্তরীক্ষে আবার কেউ গেল অতল সমুদ্রের তলদেশে। এবং তাদের এই নিরলস চেষ্টার ফল স্বৰূপেই তো বিশ্ব অনেক চমকপ্রদ বিষয়ের সম্বন্ধে হয়েছে অবগত।

সেইরকমেই একটি চমকপ্রদ পরিঘটনার বিষয়ে বলি, তা হ'ল প্রজাপতির প্রবজন (The migration of Butterfly)। শীতের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বা প্রজননের নিমিত্তে পক্ষী বা মৎস্যকুলের মধ্যে প্রবজনেয় পরিঘটনা লক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, জানুয়ারী মসের প্রারম্ভে ডিব্রুগড় প্রমুখ ব্রহ্মপুত্রের তটে তাই তো দেখা যায় মানস সরোবর থেকে আগত বালি হাঁসকে। কিন্তু 'প্রজাপতির প্রবজন' কথাটি শুনে আজব লাগে, তাই না? তবে এ আজব দুনিয়ায় কথা কিন্তু আজব নয়স বরং সত্যি বটে। সম্প্রীতি আবিস্কৃত হয়েছে যে কয়েক প্রজাতির প্রজাপতিও পক্ষী-মৎস্যের ন্যায় প্রবজন করে। উদাহরণ স্বরূপে, উত্তর আমেরিকার মোনার্ক নাম্নী প্রজাপতি। গ্রীষ্মে মোনার্ক সমগ্র উত্তর আমেরিকার, কানাডা, আলাস্কা প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। শরতের মাঝামাঝিতে রো দলবদ্ধ হয়ে দক্ষিণে অভিমুখে উড়তে শুরু করে, যাত্রাপথে তাদের দলে যোগদান করে আরও নতুন নতুন প্রজাপতি। প্রায় ২৫০০ কিঃমিঃ পথ অতিক্রম করে অবশেষে তারা দক্ষিণ আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া মেক্সিকো তথা ফ্লোরিডা প্রভতি স্থানে বসতি স্থাপন করে। এখানকার জলবায়ু উত্তরের তুলনায় উষ্ণ, তাই মোনার্ক প্রজাপতির প্রজাপতিরা প্রায় সম্পূর্ণ শীতকাল দক্ষিনেই অতিবাহিত করে। তারা সেখানে কোনো বিশেষ বৃক্ষকে আশ্রয় করে শীতকালীন গভীর নিদ্রাস শায়িত হয়। আশ্চর্যের কথা হ'ল য়ে, প্রতিটি প্রজাপতিয়ে দল প্রতিবারই পূর্ব বর্ষে বাস করা নির্দিষ্ট বৃক্ষতেই আশ্রয় নিতে আসে। বসন্তের প্রাক্কালে তারা তাদের উত্তরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন্ শুরু করে আবার জুন মাসের মধ্যে কানাডা প্রভৃতি স্থানে কিরে আসে। এবং নিজেদের মূল আবাসে

ডিম দিয়ে তারা তাদের জীবনকাল পূর্ণ করে। এই প্রজাপতির (মোনার্ক) পূর্ণাংগ কাল ১০ মাস এবং এ ১০ মাসের আয়ুতে এরা ৫০০০ কিঃ মিঃ ভ্রমণ করে। কিছু কিছু প্রজাপতি আবার প্রত্যাবর্তনের সময়ে প্রশান্ত মহাসাগর পার করে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যণ্ড প্রভৃতি স্থানেও পোঁছে যায়।

পেন্টেট লেডি প্রজাপতি (The painted lady Butterfly) নাম্নী প্রজাপতি ও প্রবজনেও লক্ষনীয়। কুমেরু বৃত্ত থেকে শুরু করে সমগ্র পৃথিবীতে এই প্রজাপতি পাওয়া যায়। সাধারনত ঃ শীতকালে উত্তর আফ্রিকার মরুভূমি অংশে এরা প্রজননের উদ্দেশ্যে গমন করে এবং সেখানেই ডিম পাড়ে। বসন্তের আগমনের সাথে সাথেই তারা উত্তেরের দিকে যাত্রা করে। বিষুবরেখা পার করে এপ্রিলি উত্তর আমেরিকা, মে মাসে ইউরোপ এবং ধীরে ধীরে ব্রিটিষ দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছে যায়। যাত্রাপথে প্রায় ৩০০০ কিঃ মিঃ অতিক্রম করে ইংল্যেণ্ডে এরা ডিমে তা দেয় এবং নবজাতক জন্ম লাভেচ নাউড়তে শিখে শরতের শুরুতে আবার দক্ষিণের দিকে গতি করে।

❑❑❑

ছয় ঋতুং

প্রনব দত্ত
স্নাতক প্রথম বর্ষ (বিজ্ঞান)

দারুণ মজা ভাই
বৈশাখ জৈষ্ঠ,
বর্ষায় ভিজে হয়
সর্দিতে কষ্ট।
শরতে দারুণ মজা
উৎসব ঘরে ঘরে,
হেমন্ত পাকা ধান
কালমল করে।
শীতে যে ধনরি সুখ
গরিবের কষ্ট।
বসন্তে খুব ভালো
ঋতুদের শ্রেষ্ট।

❑❑❑

পরমাণু বোমা

তন্তরা দত্ত
স্নাতক প্রথম বর্ষ,
গণিত বিভাগ

দানবের চেয়েও বেশি ভয় পাই
পরমাণু বোমাকে,
ভয় আরু বয় শুধু ভয় হয়
চাই না যে তোমাকে।
নাগাসাকি আর হিরোসীমাতে
ফেটেছিলে যে তুমি
এক পলকেই কাঁপল জাপান,
ফিউজি পার্বত্য ভূমি
হাজার হাজার লোক পঙ্গু আজও
তবুও নতুন সাজে কেন গো সাজো?
আর নয় আর নয় -
যাও ইতিহাসের পাতায়
সভ্যতা যে বিপন্ন
ঘোর বীভৎস বর্বরতায়।

❑❑❑

মায়ের হাসি

প্রনব দত্ত
বিজ্ঞান স্নাতক প্রথম বর্ষ

'মায়ের হাসি শান্ত সবুজ
সরল সতেজ সাদা,
মায়ের হাসিতে পার হয়ে যাই
বহু দুর্গম বাধা।
মায়ের হাসি সুনীল আকাশ
সৃষ্টি সুখের দিন,
মমতা মাখানো স্নেহের পরশ
প্রীতি স্পর্শেয় ঋণ।
মায়ের হাসিতে খুঁজে পাই
ছেট্টি ছেলে বেলা,
মায়ের হাসিতে স্মৃতি জেগে উঠে
ঘুমপাড়ানীয় খেলা।
মায়ের হাসি দেখেছি তাইতো
জাৱন স্বপ্নময়,
মাটির ধরনী তাইতো আজও
সুখের স্বর্গ হয়।

❑❑❑